তখনি দিল

অন্নদাশঙ্কর রায়

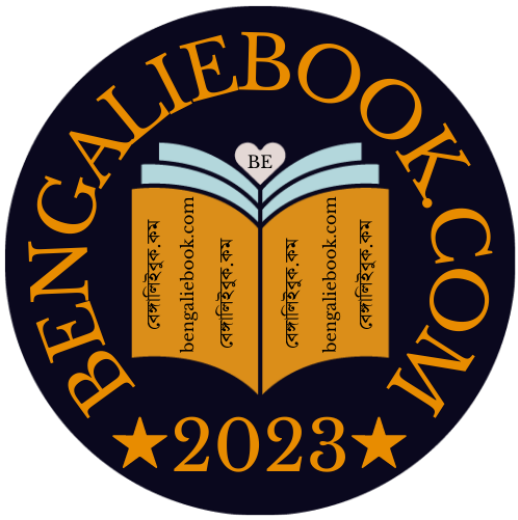

জখমি দিল

মন্বন্তরের বছর আলমোড়া গিয়ে দেখি সেখানেও মানুষের মুখে হাসি নেই। তারা বলাবলি করছে, 'ডিসেম্বর মাসে এখানেও আকাল পড়বে।' শুনে নিরাশ হলুম।

নিরাশ হয়েছি এই কথাটা ভাঙা হিন্দিতে সমঝিয়ে দিচ্ছি আমার ব্যাঙ্কারকে, খেয়াল হয়নি যে তাঁর সঙ্গে কুমায়ুনি ভাষায় আলাপ করেছেন যিনি তিনিও বাঙালি। তাঁর পোশাক পরিচ্ছদ কুমায়ুনিদের মতো। যোধপুর ব্রিচেসের উপর গলাবন্ধ কোট, মাথায় দেশি টুপি। কপালে চন্দনের ফোঁটা। লম্বা চওড়া জমকালো চেহারা। বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে, গোঁফদাড়ি কামানো।

ভদ্রলোক আমার দিকে ফিরে পরিষ্কার বাংলায় বললেন, 'নৈরাশ্যের কথা যদি তুললেন তো অমন যে কাশ্মীর—যাকে ভূস্বর্গ বলে—সেখানেও মানুষ খেতে পায় না। ভারতের এমন অঞ্চল নেই যেখানে আমি যাইনি, কিন্তু কোথাও দেখিনি যে মানুষ পেট ভরে খেতে পাচ্ছে।'

শাহজি কত দূর বুঝলেন জানিনে, তিনিও মাথা নেড়ে সায় দিলেন। আমি কাশ্মীর যাবার কথা ইতিপূর্বে ভাবছিলুম, কিন্তু এরপরে সে-ভাবনা ত্যাগ করলুম। আমার বিমূঢ় দশা লক্ষ করে ব্যাঙ্কার বললেন হিন্দিতে, 'মল্লিকজির সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই? আপ পলিটিকল লিডর থে। অব জখমি দিল।'

শুনলুম ভদ্রলোক এখন এখানকার ‘নন্দা দেবী রেস্টুরেন্ট’-এর মালিক। তখন আমার মনে পড়ল যে ইনিই তিনি যাঁর কথা স্থানীয় বাঙালিদের মুখে শুনেছি। আলিপুর বোমার মামলায় নাকি ছিলেন ফেরার আসামি।

‘ওঃ, আপনি!’ আমি নমস্কার করলুম। মল্লিক কিনা মল্লিকজি। তিনি বললেন, ‘নমস্তে।’ তারপরে আমরা দুজনেই কাজ সেরে একসঙ্গে গা তুললুম।

মল্লিক যখন জানালেন যে তাঁর রেস্টুরেন্ট খুব কাছেই তখন আমি জানালুম যে আমার হাতে আর কোনো কাজ নেই। চললুম তাঁর সঙ্গে।

রেস্টুরেন্টের উপরতলায় তাঁর ফ্ল্যাট। বারান্দা থেকে হিমালয় দেখা যায়—হিমালয়ের কয়েকটি শৃঙ্গ। প্রাকৃতিক দৃশ্যে তন্ময় হলুম দুজনে। কখন একসময় কাশ্মীরের প্রসঙ্গ উঠল।

‘যা বলছিলুম। কাশ্মীর গেলে যে আপনি কোটি মানুষের সুখ দেখে সুখ পেতেন তা নয়। আমি তো সারা ভারতের কোনোখানেই পাইনি। যে-দেশে যা নেই তা আমি খুঁজলেও নেই, আপনি খুঁজলেও নেই। তেমন সুখ যদি দেখতে চান তো ছুটি নিয়ে ভারতের বাইরে যান। এই অভিশপ্ত দেশে...’ বলতে বলতে তাঁর দুই চোখ ছলছলিয়ে উঠল।

তাঁকে দেখে মনে হয় না যে কখনো ভারতের বাইরে গেছেন, আন্দামান বাদ দিলে। তাই প্রশ্ন করলুম, 'ভারতের বাইরে কোন কোন দেশে গেছেন?'

'ইংল্যাণ্ডে, সুইটজারল্যাণ্ডে, পশ্চিম ইউরোপের প্রায় সর্বত্র।'

এসব দেশ আমারও ভালো লেগেছিল। জিজ্ঞাসা করলুম, 'ক-বছর ছিলেন?'

এর উত্তরে তিনি কী জানি কী ভাবলেন, তারপরে বললেন, 'রাম যত বছর নির্বাসনে ছিলেন।'

'চো-দ্দো বছর!' আমি আশ্চর্য হলুম। কথাবার্তায়, চালচলনে, পোশাক-পরিচ্ছদে তার আভাস মাত্র নেই।

আমার বিশ্বাস হচ্ছে না লক্ষ করে তিনি বিলিতি ধরনে হা-হা করে উঠলেন। তারপর ফরাসিতে মাফ চাইলেন, 'পারদঁ!' তারপর জার্মান ভাষায় গান ধরলেন, 'Herz mein herz sei nicht becklommen...'

হৃদয়, আমার হৃদয়, ব্যথায় কাতর হোয়ো না...

তাঁর কণ্ঠের কারুণ্য আমার নয়নপল্লবে সঞ্চারিত হল। আমি চেপে ধরলুম, 'বলুন-না কী আপনার ব্যথা, যদি গোপনীয় না হয়।'

এর উত্তরে তিনি যা বলেছিলেন তার সবটা মনে নেই, মনে থাকলেও লেখার সময় আসেনি। একাংশ লিখছি।

আর ভাবছি তিনি এখন কোথায়!

তখন স্বদেশির যুগ। বয়স কাঁচা। দেশের মাটির দিকে চেয়ে আমার মনে ভাব জাগত, মাটি কি সত্যি মাটি না চিন্ময়ী মায়ের মৃৎপ্রতিমা? আমরা প্রতিমা পূজা করি বলে ওরা যে আমাদের অবজ্ঞা করে, ওরা কি জানে না যে এই জল এই হাওয়া সবই এক-একটি প্রতিমা? যাঁর প্রতিমা তিনি ভারতমাতা।

একালের ছেলেরা শুনে হাসবে, কিন্তু সেকালে আমরা সত্যি বিশ্বাস করতুম যে ভাতরমাতা বলে বস্তুত কেউ আছেন, যেমন জগন্মাতা বলে কেউ আছেন। সেই ভারতমাতাকেই বন্দনা করে বলতুম, 'ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী কমলা কমলদলবিহারিণী বাণী বিদ্যাদায়িনী'। মনে মনে বলতুম, মা, তুমি যদি শক্তিময়ী তবে তোমার শক্তি কেন সুপ্ত রয়েছে! মা, তোমার শক্তির পরিচয় দাও। মহিষমর্দন করো। সিংহবাহিনী, সিংহটা যে বড়ো বাড়াবাড়ি করছে, মা। ওকে শায়েস্তা করো।

হাসছেন। কিন্তু তখন আমরা ভুলেও হাসতুম না। আমরা প্রত্যেকেই ছিলুম অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত। ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হতুম। ভিতরের আগুন বাইরেও জলত। হাসবেন, আমরা কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস করতুম যে মা একদিন আক্ষরিক অর্থে জাগবেন। আমরা স্বচক্ষে দর্শন করব জাগ্রত দেবতা দশপ্রহরণ ধারণ করে দশ হস্তে সংগ্রাম করছেন। আজ কলকাতায়, কাল পাটনায়, পরশু দিল্লিতে তিনি যুদ্ধের পর যুদ্ধ জয় করছেন। দেখব কয়েক দিন পরে একটিও শত্রু অবশিষ্ট নেই। দেশ স্বাধীন।

ধীরে ধীরে জ্ঞান হল, ওসব সত্যযুগে সম্ভব, কলি যুগে নয়। এ যুগে মা তাঁর আপন শক্তি আমাদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আমরাই তাঁর এক-একটি হাত, আমরাই ধরব এক-একটি প্রহরণ। জাগব আমরাই, আমরাই যুঝব।

তখন আমরা অস্ত্র সংগ্রহে মন দিলুম, অস্ত্রচালনা শিখলুম। কেমন করে বোমা তৈরি করতে হয়, কেমন করে বারুদ তৈরি করতে হয়, শেখা গেল এসব। ভেবেছিলুম কেউ টের পাবে না, জানতুম না যে দেয়ালেরও কান আছে। দলের লোক ধরা পড়ল, আমিও পড়তুম, কিন্তু বাবার ছিল ওষুধের দোকান, তলে তলে চোরাই মদের কারবার। জাহাজি গোরাদের কাছ থেকে তিনি মাল আমদানি করতেন। সেই সূত্রে জাহাজি গোরাদের সঙ্গে তাঁর ভাব ছিল। তারাই আমাকে লুকিয়ে চালান দিল ইংল্যাণ্ডে। তখনকার দিনে পাসপোর্টের হাঙ্গামা ছিল না। ইংল্যাণ্ড আমাকে আশ্রয় দিল। স্বেচ্ছায় নির্বাসিত হয়ে রক্ষা পেলুম দ্বীপান্তর হতে। ইংরেজ আমাকে উদ্ধার করল ইংরেজের রোষ থেকে।

এই ঘটনার পর আমার ব্রিটিশবিদ্বেষ আপনি অন্তর্হিত হল। বিলেতে বাস করে দেখলুম ওরা রাক্ষস নয়, পঙ্গপাল নয়, আমাদের মতো মানুষ। বিলেত দেশটাও মাটির। সে-মাটিও মাটি নয়, মৃন্ময়ী মা। ভক্তি জন্মাল। মা ব্রিটানিয়াকে মনে মনে বন্দনা করলুম। বললুম, মা, তুমি জাগ্রত দেবতা। তোমার শক্তি বদ্ধ নয়, বিকীর্ণ। তোমার অভিব্যক্তি কত উপনিবেশ, কত অধীন দেশ, কত বন্দর, কত নৌঘাঁটি, কত যুদ্ধজাহাজ, কত কামান। আবার কত বড়ো সাহিত্য, কী মহান ধর্ম, কী উন্নত বিজ্ঞান, কী উদার গণতন্ত্র। মা, তুমি তোমারই গৌরবের জন্যে ভারতকে মুক্তি দাও।

জাহাজে উঠে নাম বদলেছিলুম। সেই নামে টাকা যেত বাড়ি থেকে বিলেতে। টাকার অভাব ছিল না। লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশনের জন্যে পড়াশুনা করতুম আর সভাসমিতিতে হাজিরা দিতুম। আয়ার্ল্যাণ্ড কীভাবে তার স্বাধীনতা ফিরে পায় তাই লক্ষ করা ছিল আমার প্রধান কাজ। আইরিশ হোম রুল আন্দোলনের কর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে দিনের পর দিন কাটত। আইরিশদের মধ্যে তখন আরও একটা আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যার নাম শিন ফেন। এই তরুণ আন্দোলনের সঙ্গে আমার হৃদয়ের যোগ ছিল। সেই সূত্রে অনেক বার আয়ার্ল্যাণ্ডে গেছি। বন্ধুরা আমাকে পীড়াপীড়ি করত ডাবলিনে আইন পড়তে। কিন্তু লণ্ডনের আকর্ষণ দুর্বার। নানা দেশের আশ্রয়প্রার্থীতে লণ্ডন তখন ভরা। কেউ রাশিয়ান, কেউ চীনা, কেউ তুর্ক, কেউ পোল। তাদের আড্ডা বসত এক-একটা রেস্টুরেন্টে। আমি সেসব রেস্টুরেন্টে গিয়ে তাদের সঙ্গে মিশতুম। কিন্তু ঠিক বুঝতে পারতুম না তাদের কর্মনীতি। আর তারাও বুঝত না ভারতীয় রাজনীতি। কাজেই আইরিশদের সঙ্গেই আমার বনত ভালো। অথচ মিশতে মন যেত স্বাধীন জাতিদের

সঙ্গে। হাজার হোক রুশরা চীনারা তুর্করা স্বাধীন। পোলরা অবশ্য তা নয়, সেটা ব্যতিক্রম।

ভারতীয় মহলে আমার অবাধ গতিবিধি। ভারতীয়দের একাধিক দল, নরম গরম দুই দলের সঙ্গে আমার সামাজিকতা ছিল, কিন্তু গভীর সম্বন্ধ ছিল কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে। ওঁর ওখানে কেউ এলেই ডাক পড়ত আমাকে। একবার দেখি দক্ষিণ আফ্রিকার এক ব্যারিস্টার এসেছেন। গান্ধী তাঁর নাম। চমকে উঠলেন যে! হ্যাঁ, আপনাদেরই মহাত্মা গান্ধী। তখন তিনি মহাত্মা ছিলেন না, ছিলেন নিতান্তই মিস্টার। তখন আমরা কেউ স্বপ্নেও ভাবিনি যে এই নিরীহ গোবেচারি একদিন ভারতের মহানেতা হয়ে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন। তবে তাঁর কথাবার্তা শুনে আমাদের মনে ধাক্কা লেগেছিল। পরে আমরা সে-ধাক্কা কাটিয়ে উঠি কফির পেয়ালায় চুমুক দিয়ে।

ওঃ আপনি শুনতে চান কী কথাবার্তা? আচ্ছা বলছি। আমার স্পষ্ট স্মরণ আছে, যদিও ১৯০৮ কি ১৯০৯ সালের কথা। সাবারকার সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হ্যাঁ, আপনাদেরই বীর সাবারকার। আশ্চর্য না? কে জানত তিনি একদিন হিন্দু মহাসভার কর্ণধার হবেন। কই, তেমন কোনো হিঁদুয়ানি তো তখনকার দিনে দেখিনি। যা হোক, যা বলছিলুম।

সাবারকার শুধালেন গান্ধীকে, ‘মনে করো মস্ত একটা সাপ তোমার দিকে ফণা তুলে তেড়ে আসছে। তোমার পালাবার পথ নেই, পিছনে গভীর খাদ। তোমার হাতে একগাছা

ছড়ি আছে, তা দিয়ে ইচ্ছা করলে আত্মরক্ষা করা যায়। তখন তুমি কী করবে? মারবে না মরবে?'

গান্ধী এক মুহূর্ত ভাবলেন না, তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'ছড়িখানা আমি ফেলে দেব, পাছে আমার লোভ জাগে তাকে মারতে।'

অবাক হচ্ছেন? অবাক হবারই কথা। এমন কথা আমি জন্মে কখনো শুনিনি, তাই পঁয়ত্রিশ বছর পরে আজও আমার স্পষ্ট মনে আছে—'I would drop the stick lest I should feel tempted to kill it.'

সেদিন সেখানে আমরা যে কয়জন উপস্থিত ছিলুম সকলের শ্বাস উড়ে গেল। ছড়ি ফেলে দিলে সাপ কি আমাদের ছাড়বে? মনের সুখে গিলবে। সাবারকার বললেন, 'গান্ধী, তুমি আমার ধর্মগুরু হতে পারো, কিন্তু রাজনৈতিক নেতা হতে অক্ষম।' সেকথা আমাদের সকলের মনের কথা।

গান্ধী কিছুদিন পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরে গেলেন, আমরাও ভুলে গেলুম তাঁকে। রাজনীতিক্ষেত্রে অহিংসার কোনো মানে হয় না, ওটা নিছক পাগলামি। তাই আমরা তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে তর্ক করিনি। আমাদের তর্কের বিষয় ছিল সাধারণত এই যে, স্বরাজ কি যোগ্যতার প্রমাণ দিলে পাওয়া যাবে, না অস্ত্রের দ্বারা ছিনিয়ে নিতে হবে?

অস্ত্রের দ্বারা ছিনিয়ে নেওয়াই যদি স্থির হয় তবে অস্ত্র কোথায় পাব? অস্ত্র পেলেও অস্ত্রশিক্ষার কী উপায়?

আমাদের মধ্যে জন কয়েক ছিলেন, তাঁরা বলতেন, জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ একদিন বাঁধবেই, তখন অস্ত্র জোগাবে জার্মানি, অস্ত্রবিদ্যাও সেই শেখাবে। এত বড়ো কথা ভাবতে আমার ভয় করত। তা ছাড়া আমি ছিলুম সত্যি সত্যি ইংরেজভক্ত। না, রাজভক্ত নয়, ইংরেজভক্ত। যুদ্ধে জার্মানির চর হওয়া যদি অস্ত্র সংগ্রহের ও অস্ত্রশিক্ষার একমাত্র উপায় হয় তবে চাইনে ওসব। কিন্তু আমার ও আমার মতো অনেকের তখন ধারণা ছিল অন্য উপায় আছে। সে উপায় যুদ্ধে ইংরেজের পক্ষে যোগ দেওয়া।

যুদ্ধ যখন বাস্তবিক বাঁধল তখন আমাদের সেই ক-জনকে খুঁজে পাওয়া গেল না, তাঁরা ততদিনে বার্লিনে। আমরা গিয়ে কর্তাদের জানালুম, আমরা লড়তে প্রস্তুত, সৈন্যদলে আমাদের নেওয়া হোক। আমার নিজের পক্ষপাত আর্টিলারির উপর। অনেক দিনের সাধ গোলন্দাজ হতে। তদবির করলুম। কিন্তু ভবি কেন ভুলবে! কর্তারা বললেন, তোমাদের চেহারা সুবিধের নয়, অর্থাৎ রাজনীতি সুবিধের নয়।

তখন যে যার নিজের কাজে মন দিল। আমি কোনো কাজেই মন দিতে পারলুম না। এত বড়ো সুযোগ জীবনে দু-বার আসে না। এমন সুযোগও ব্যর্থ গেল। এ জীবন রেখে লাভ। মনের অসুখ শরীরে সংক্রামিত হল। ডাক্তার বলল, সুইটজারল্যাণ্ডে না গেলে সারবে না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড থেকে বিদায় নিলুম। সুইটজারল্যাণ্ডে গিয়ে দেখি ছোট্ট একটা

দেশ, সেও কেমন স্বাধীন, কেমন সমৃদ্ধ। পর্বতকে মানুষ বশ করেছে, তার পিঠে শহর বসিয়েছে। সেখানে যতরকম আরাম পাবে, যতরকম খেলা, যতরকম আমোদ। সুইটজারল্যাণ্ড আমার ইংল্যাণ্ডের চেয়েও ভালো লাগল। সেখানেও নানা দেশের রাজনৈতিক শরণাগত।

সুইটজারল্যাণ্ডে থাকতে খবর পেলুম রাশিয়ার জার সিংহাসন ত্যাগ করেছেন, সেদেশে যা ঘটেছে তার নাম নাকি বিপ্লব। উল্লাসে অধীর হলুম। ইচ্ছা করল সেদেশে উড়ে যেতে, কিন্তু উড়ব কী করে? ডানা নেই যে। দেখলুম শরণাগতরা সবাই উত্তেজিত। বিপ্লব যদি এক দেশে ঘটল তবে অন্য দেশেও ঘটবে—অস্ট্রিয়াতে, জার্মানিতে, তুরস্কে। আমি মনে মনে জুড়ে দিলুম, ভারতেও। যেই ও-কথা ভাবা অমনি শরীর সেরে যাওয়া। আমি আমার লুতসার্নের বন্ধুদের ডেকে ভোজ দিলুম। কিন্তু কে জানত সেই বছরই সেই রুশ দেশেই আর এক দফা বিপ্লব ঘটবে। কেন ঘটল কিছুই ঠাহর হল না। আমার রুশ বন্ধুদের জিজ্ঞাসা করলুম। তাঁরা তো রেগে টং। আমার উপর নয়, বলশেভিকদের উপর। বললেন, ওরা ডাকাত, ওরা চোর, ওদের ওটা বিপ্লবই নয়, ওটা বর্গির হাঙ্গামা।

কিন্তু আমার সন্দেহ মিটল না, উত্তরোত্তর বাড়তে থাকল। আমার এক মার্কসপন্থী আলাপী ছিলেন, তিনিই আমাকে ধীরে ধীরে বোঝালেন মানুষের ইতিহাসটা শ্রেণিসংঘাতে ভরা। ওর একটা বিশেষ অধ্যায় এক দিন আরম্ভ হয়েছিল ফরাসি বিপ্লবে, বুর্জোয়া আধিপত্যে। এতদিনে শেষ হল কেরেনস্কির পতনে, বুর্জোয়াদের মূর্ছায়। এখন থেকে শুরু হল ইতিহাসের শ্রমিক অধ্যায়। সব দেশেই এই হবে। একথা শুনে আমার মনে

প্রশ্ন জাগল, জারের সঙ্গে জারতন্ত্রের সঙ্গে একশো বছর ধরে যুঝল যারা তাদের প্রাণদানের, তাদের নির্বাসনের, তাদের কারাভোগের এই কি পুরস্কার। ছ-সাত মাস রাজত্ব করতে-না-করতে রাজ্যকাল গেল ফুরিয়ে। শেষ হয়ে গেল তাদের যুগ, সেই লক্ষ লক্ষ শহিদের পুরস্কারের যুগ। এর উত্তরে মার্কসপন্থী বললেন, ইতিহাস তাদের মেরে রেখেছে, লেনিন তো নিমিত্ত মাত্র।

ইতিহাস পড়িনি, এই যদি হয় ইতিহাসের ব্যাখ্যা তবে ইতিহাস পড়ে সুখ নেই। ভারতমাতাকে মনে মনে ডেকে বললুম, মা, আমরা যে তোমাকে এতকাল বন্দনা করে আসছি, তোমার জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝুলছি, দ্বীপান্তরে মরছি, কারাগারে পচছি, সেকি এইজন্যে? এই কি তোমার ন্যায়বিচার যে আমরা দু-দশ মাস রাজত্ব করেই সিংহাসন থেকে নামব, আর সেই সিংহাসনে উঠবে শ্রমিক শ্রেণি? তা হলে আমরা কেন এমন করে বুকের রক্ত পাত করছি?

এরপরে কিন্তু আমার ভগবানে বিশ্বাস চলে গেল, সুতরাং ভারতমাতায়। জগতে যদি ন্যায়বিচার না থাকে তবে ভগবানও থাকেন না, দেশজননীও না। রাশিয়া থেকে আরও শরণাগত এসে জুটল, এবার বলশেভিকদের অত্যাচার থেকে। তাদের মুখে শ্রেণিবিদ্বেষের কথা শুনতে শুনতে আমার ধারণা জন্মাল যে ইতিহাসটা শ্রেণিসংঘাতে ভরা। তাই যদি হল তবে বুর্জোয়ারা চিরদিন রাজত্ব করতে পারে না। দু-মাস পরে হোক, দু-শতাব্দী পরে হোক, একদিন না একদিন তাদের পুনর্মূষিক হতে হবেই। ত্যাগ

করলেও যে-পরিণাম, ত্যাগ না করলেও সেই একই। ত্যাগ তবে করব কেন? করব ত্যাগের জন্যেই।

বুকটা দমে গেল। তার আগে আমার বুকের ব্যামো ছিল না, তখন থেকে হল। স্বৈরতন্ত্রের অবসানের জন্যে যারা প্রাণ দিয়েছে, তাদের পরিবারের লোক দেশ ছেড়ে পালিয়ে এসেছে প্রাণ নিয়ে। এরা এখন নিঃস্ব। দেশ থেকে কেউ এদের টাকা পাঠাবে না, এরা বিদেশির দয়ানির্ভর। একদিন ভারতেও কি একইরকম হবে, এইভাবে দেশান্তরি হবে আমার আত্মীয়স্বজন? এই কি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের ধারা?

এরপরে জার্মানিতে বিপ্লব ঘটল ও সে-বিপ্লব সফল হল। বিপ্লব তাহলে সব দেশে সফল হয় না। আমি আশ্বস্ত হলুম। হঠাৎ যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় একটা দুঃস্বপ্নের বোঝা নেমে গেছল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। প্যারিসে গিয়ে হাজির হলুম ও বাসা করলুম পিস কনফারেন্স দেখতে। ভার্সাইতে যেদিন সন্ধি স্বাক্ষরিত হয় সেদিন আমি ছিলুম সেখানে। জার্মানির লাঞ্ছনা দেখে আমার চোখে জল এল। ভাবলুম জার্মানদের বিপ্লব যদি সফল হত তা হলে কি ভার্সাইতে তাদের এ দশা হত! মনে হল মধ্যবিত্তদের মাজা দুর্বল, অতি সহজেই তারা অপমান মাথা পেতে নেয়, ইতিহাস তাই তাদের ঘাড়ে ভার্সাই চাপিয়ে দেয়।

ফল হল এই যে আমার স্বশ্রেণির প্রতি আমার অনাস্থা জন্মাল। আমার নিজের অলক্ষে মার্কসপন্থী হয়ে উঠলুম। না, কমিউনিস্ট নয়। এমনি সাধারণ অর্থে মার্কসিস্ট। ক্রিয়াকর্মে

নয়, মতবাদে। হিন্দুর ছেলে ব্রাহ্মসমাজে নাম না লিখিয়ে তো নিরাকারবাদী হয়। আমিও তেমনি কমিউনিস্ট না হয়েও মার্কসিস্ট। আমার জীবনে এক নতুন পৃষ্ঠা খুলে গেল। প্রতিমা-পূজক আমি, সর্বপ্রথমে ভাবলুম ভারতমাতার প্রতিমা। 'বন্দে মাতরম'-এর উপবীত বর্জন করলুম। অতঃপর বহু দেশ ঘুরি, কিন্তু রাশিয়ায় যাবার ছাড়পত্র পাইনে। হয়তো আরও কিছুদিন পরে পেতুম। কিন্তু দেশে ফেরবার জন্যে প্রাণ ব্যাকুল হয়েছিল। মস্ত ভুল করলুম দেশে ফিরে। আমার ধারণা ছিল দেশ একেবারে বদলে গেছে এবং সে-পরিবর্তন দেখবার মতো। অনেক তদবির করে দেশে ফেরবার অনুমতি পাই। অভয় পাই যে আর আমার বিরুদ্ধে মামলা চালানো হবে না। আমার সহকর্মীরা মার্জনা পেয়ে আন্দামান থেকে ফিরেছিলেন। অতএব আমাকে মার্জনা করা কঠিন হল না।

দেখলুম জোর অসহযোগ আন্দোলন চলছে, তার নেতা হয়েছে গান্ধী। গান্ধীর মতো অদ্ভুত লোককে যারা নেতা করতে পারে তারা সব পারে। দেশের মতিগতি আমাকে হতাশ করল। রাজনীতিক্ষেত্রে জৈন ধর্মের প্রয়োগ দেখে আমি তো ধরে নিলুম দেশ তিন হাজার বছর পেছিয়ে যাবার উদ্যোগ করছে। একে তো দেশটা যারপরনাই গরম, তার উপর খদ্দর পরবার ফরমায়েশ শুনে মেজাজ গেল বিলকুল বিগড়ে। তার পরে যখন কানে এল যে মদ খাওয়া পাপ তখন আমি পাসপোর্টের জন্যে দরখাস্ত করলুম। ইউরোপে ফিরে যাবার পাসপোর্ট। কিন্তু ইতিমধ্যে আমার ভক্তেরা রটিয়েছিল যে আমি আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়ে গুপ্তবিদ্যা শিখে এসেছি ও বাংলা দেশের ছেলেদের ও-বিদ্যা শেখাতে চাই। খবরটা সরকারি মহলে আতঙ্ক সঞ্চার করে। তার ফলে আমার পাসপোর্ট পাওয়া তো হলই না, তার বদলে হল মাদ্রাজের ভেলোর জেলে বিনা বিচারে অবরোধ। মদ

খাওয়া যখন কপালে লেখেনি তখন কী আর করি! ঘটর ঘটর করে চরকা ঘোরাতে শুরু করে দিলুম। মাছ-মাংস ছাড়তে হল মাদ্রাজিদের রান্নার সঙ্গে অসহযোগ করে। সকলেই স্বীকার করল যে অসহযোগী বটে। কিন্তু গরমে মারা যাচ্ছিলুম। গভর্নমেন্টকে লেখালেখি করে বদলি হলুম এই আলমোড়ায়, মানে আলমোড়া জেলে। ছাড়া পেলুম তিন বছর পরে।

ছাড়পত্রের আশা ছিল না। অথচ ইউরোপের আকর্ষণ তীব্র। চললুম বম্বে, সেখানে একটা রেস্টুরেন্ট খুলে বসলুম। বিনা খরচে মদ খাবার ফন্দি। জাহাজ ভিড়লেই আমি যাই ইউরোপীয় যাত্রীদের সঙ্গে ভাব করতে, তাদের ধরে এনে মদ খাওয়াতে, মদের গেলাসের উপর গল্প জুড়তে। ইউরোপের তাজা খবর সেইভাবে আমার কানে আসত, আর সেরা মদও আসত আমার সেলারে। বম্বে আমার বেশ সুট করেছিল, মাঝে মাঝে সেখান থেকে জলপথে সিংহলে বেড়িয়ে আসতুম, কলেম্বোতে বড়ো বড়ো জাহাজ ধরতুম। ইউরোপের স্বাদ পেতুম সেসব জাহাজে। বয়স থাকলে আবার পালাতুম তার কোনো একটা জাহাজে, কিন্তু এত বয়সে আর অ্যাডভেঞ্চার সাজে না। ধরা পড়লে জেল।

বম্বে থাকতে কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। কংগ্রেসে ঢুকে দেখলুম ওর নেতারা কেউ দিগম্বর জৈন নন, গান্ধীকে ওঁরা মান্য করেন অন্য কারণে। সে-কারণটি এই যে গান্ধীই একমাত্র লোক যিনি সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স কাকে বলে জানেন। যেই সিভিল ডিসওবিডিয়েন্সের দিন ঘনিয়ে এল অমনি আমিও চরকা কেটে খদ্দর পরে মদের শেষ

স্বাদ নিয়ে তালগাছ খেজুরগাছ কাটবার জন্যে তৈরি হলুম। আমার মার্কসীয় বস্তুবাদ আমাকে নিবৃত্তি করতে পারল না, আমি গলা ছেড়ে হাঁকলুম, 'বন্দে মাতরম!' 'আল্লা হো আকবর!' 'মহাত্মা গান্ধীকি জয়!'

থাক, আর বাড়াব না। কয়েক বছর পরে ভাঙা মন নিয়ে জেল থেকে বেরোবার আগে ভালো করে মার্কস লেনিন পড়ছিলুম, পড়ে গান্ধীজির ব্যর্থতার হেতু উপলব্ধি করেছিলুম। ইচ্ছা ছিল নতুন উদ্যমে কাজে লেগে যাব, কিন্তু বুকের ব্যামোর জন্যে বাধ্য হয়ে বম্বের মায়া কাটাতে হল। আলমোড়ার সুবিধে এই যে এখানে চুপচাপ থাকা যায়। অন্যান্য হিল স্টেশনের মতো হইচই নেই। আর হিল স্টেশনে থাকার কারণ গরম আমার একবার সহ্য হয় না। ইউরোপ আমাকে মাটি করেছে। তাই দিনরাত ভাবি, কবে আবার ছাড়পত্র পাব। দরখাস্ত করেওছি কয়েকবার, কিন্তু যুদ্ধ না থামলে আশা নেই।

আপনার কি মনে হয় যুদ্ধ খুব শিগগির থামবে? না, আমারও সে ভরসা নেই।

সেদিন মল্লিকজি আমাকে না খাইয়ে ছাড়লেন না, কাজেই আমিও তাঁকে অনুরোধ জানালুম একদিন আমাদের সঙ্গে খেতে। তিনি রাজি হলেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আমার স্ত্রী যখন তাঁকে চিঠি লিখে নিমন্ত্রণ করলেন তখন জবাব এল তাঁর ভাগনের কলম থেকে। মল্লিকজি নেই, নৈনিতাল গেছেন, কবে ফিরবেন বলে যাননি। আমরা ক্ষুণ্ণ হলুম।

একথা শুনে আমার আলমোড়ার বন্ধু লাহিড়ি বললেন, 'খেপেছেন! মল্লিকজি আসবেন আপনার হোটেলে খেতে! আপনার হোটেলের বাবুর্চি যে মুসলমান এ খবর কে না রাখে?'

আমি আহত হয়ে বললুম, 'কিন্তু মল্লিক যে ইউরোপে চোদ্দো বছর ছিলেন।'

'হ্যাঁ, কিন্তু সে-মল্লিক আর নেই। এঁর নাম মল্লিকজি, এঁর কত বড়ো চন্দনের ফোঁটা। আপনি বোধহয় লক্ষ করেননি যে বড়ো বড়ো চুলের সঙ্গে এক গোছা টিকিও আছে।'

'কিন্তু তিনি যে মার্কসীয় বস্তুবাদে বিশ্বাসবান।'

'বোধহয় সেইজন্যেই বস্তু ভালো বোঝেন। টাকা চেনেন।'

কিন্তু প্রকৃতই তিনি নৈনিতাল গেছলেন। আমি অন্য সূত্রে জেনেছিলুম। লাহিড়ি তা শুনে তামাশা করলেন, 'তা হলে আপনার নিমন্ত্রণ এড়ানোর জন্যেই তিনি নৈনিতাল গেছেন। আপনি থাকতে ফিরছেন না।'

লাহিড়ি আমাকে খুলে বললেন যে মল্লিকজি ব্যাবসাদার মানুষ, জাতধর্ম মেনে চললে এই ঘোরতর নিষ্ঠাবান শহরে পসার জমে ভালো।

মাসখানেক পরে উদয়শঙ্করের স্টুডিয়ো থেকে আসছি, পথে মল্লিকজির সঙ্গে সাক্ষাৎ। নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেনি বলে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। লক্ষ করলুম সেদিন তাঁর পরনে ইউরোপীয় পোশাক। হালকা গ্রে রঙের সুট, ফেলট হ্যাট। কপালে চন্দনের চিহ্ন ছিল না।

জিজ্ঞাসা করলেন, 'ভালো কথা, আপনার বাবুর্চি কেমন রাঁধে?'

'কেমন রাঁধে, তা আসুন-না পরখ করে দেখবেন। কবে আসতে পারবেন বলুন?'

'তার কি আর সময় আছে ভাই। আমাকে যে কাল নৈনিতাল ফিরে যেতে হয়। সেখানে নতুন একটা রেস্টরেন্ট খুলছি কিনা। নাম রেখেছি রেস্তরাঁ আঁতেরনাসিওনাল (Restaurant Internationale)।'

'তাই নাকি?' আমি চমৎকৃত হলুম। 'তা হলে কি আপনি এখানকার পাট তুলে দিচ্ছেন?'

'না। এখানকার ভার নিচ্ছে আমার ভাগনে।'

'কিন্তু হঠাৎ নৈনিতাল?'

‘ঠিক হঠাৎ নয়। ভাবছিলুম অনেক দিন থেকে। পাসপোর্টের জন্যে এখন থেকে তদবির না করলে নয়। আর তদবির করার মোক্ষম পদ্ধতি হল উদরের অভ্যন্তর দিয়ে।’

আমি হাসলুম। তিনি গম্ভীরভাবে বললেন, ‘বুঝছি আমার পতন হল। কিন্তু পতন কি এই প্রথম? এতদিন যে মল্লিকজি সেজে আলমোড়ায় বসেছিলুম সেই-বা কম কী! আসল কথা আমার কিছু পুঁজি চাই। কী নিয়ে ইউরোপে যাব? আর তো বাবা নেই যে বাড়ি থেকে টাকা পাঠাবেন।’

শেষের উক্তিটিতে করুণরস ছিল। আমি সমবেদনায় আপ্লুত হলুম। বললুম, ‘কিন্তু দেশ যে আপনার কাছে অনেক প্রত্যাশা করে, মল্লিক—’

‘—জি না। শুধু মল্লিক।’ তিনি আমার কোটের বাটনহোলে আঙুল ঢুকিয়ে একটু অন্তরঙ্গ স্বরে বললেন, ‘দেশ যখন তৈরি হবে তখন আবার আসব, যদি বেঁচে থাকি।’

তারপর তিনি জানতে চাইলেন তুলনকে তালিম দিলে সেকি ‘বফ রোতি’ ‘রাগু দ্য মুতোঁ’ ইত্যাদি বানাতে পারবে? আমি পরিহাস করলুম, ‘রোস্ট বিফ বানালে চেখে দেখবে কে? আপনি?’

তিনি অপ্রস্তুত হবার পাত্র নন। বললেন, ‘ও না খেলে আমার তাকত ফিরবে না। কিন্তু রোস্ট বিফ নয়। বফ রোতি। আমার ওখানকার মেনু ছাপা হবে ফরাসি ভাষায়। যুদ্ধের

হিড়িকে আজকাল কত রাজ্যের লোক আসছে, তাদের সঙ্গ পাওয়া আমার চাই-ই চাই। আপাতত ওই আমার ইউরোপ, আমার সঞ্জীবনী। রায়, তোমাকেও আসতে হবে একদিন। বউমাকে আমার ধন্যবাদ দিয়ো ভাই। তিনিও যদি আসেন তো সত্যি খুশি হব।'